আত্মপরিচয়

নতুন বছরের প্রথম ক্লাস: বন্ধুদের সাথে পরিচয়ের খেলা

আজ নতুন বছরের প্রথম ক্লাস শুরু হলো। ষষ্ঠ শ্রেণিতে অনেক নতুন মুখের আনাগোনা। অনেকে সবাইকে আগে থেকে চেনে না। নতুন শ্রেণিতে সবার মনে রোমাঞ্চ আর উৎকণ্ঠা। অনেকেই সহপাঠীদের চেহারা, পোশাক আর বাচনভঙ্গি দেখে অনুমান করার চেষ্টা করছে কাদের সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে। অন্বেষা সামনের দিকের একটা বেঞ্চে চুপচাপ বসেছিল। এমন সময় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক প্রবেশ করলেন এবং বললেন, আমার নাম খুরশিদা হক, সবাই ডাকে খুশি আপা। আমি তোমাদের ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক।

ষষ্ঠ শ্রেণির প্রথম ক্লাসে তোমাদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই।

তিনি বললেন, আমার পরিচয় তো এক রকমভাবে পেলে। এখন তোমাদের সাথে পরিচিত হওয়ার পালা। আমি ভাবছি, তোমাদের সাথে একটা নতুন উপায়ে পরিচিত হবো। চলো আমরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বসে কিছু কাজ করি-

- প্রথমে প্রত্যেকে একটা করে কাগজের কার্ড নেই।
- এবার এসো এই কার্ডে আমরা নিজের পরিচয় তুলে ধরার জন্য নিজের সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য লিখি যা আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখেই কেউ বুঝতে পারবে না। মনে রেখো কার্ডে আমরা কেউ নিজেদের নাম লিখবো না।

সবার লেখা শেষ হয়ে গেলে খুশি আপা কার্ডগুলো এক জায়গায় জড়ো করলেন এবং সেখান থেকে যে কোন একটি কার্ড তুলে নিয়ে সবাইকে কার্ডে লেখা পরিচয়ের বর্ণনা পড়ে শোনালেন এবং জানতে চাইলেন বর্ণনার সাথে মিল আছে এমন শিক্ষার্থী কে হতে পারে?

আত্মপরিচয়ের কার্ড

আমি বই পড়তে ভালোবাসি। নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে জানতে আমি খুব পছন্দ করি। চারপাশে মানুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কে আমার অনেক কৌতূহল। আমি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছি। সাঁতার কাটতে আমার খুব ভালো লাগে। বড় হয়ে আমি একজন বিজ্ঞানী হতে চাই।

পরিচয়ের কার্ডে লেখা বর্ণনা শুনে সবাই আশেপাশের বন্ধুদের দিকে নতুনভাবে তাকাতে শুরু করলো। তাদের চেহারা, পোশাক অথবা কথা বলার ধরন কেমন তার বদলে তাদের কী কী গুনাবলি আছে সেটা বোঝার চেষ্টা শুরু করলো। বন্ধুদের যতটুকুই চেনে তার ভিত্তিতে তারা প্রকৃতি, অনুসন্ধান, জয় আর মিলিকে দাঁড় করিয়ে দিলো। খুশি আপা অবাক হয়ে বললেন, বাহ্! আত্মপরিচয়ের কার্ড একটা কিন্তু তোমরা খুঁজে পেয়েছে চার জনকে। স্বভাবতই খুশি আপা জানতে চাইলেন যে, কার্ডটা কার ছিলো? মিলি জানালো যে কার্ডটা তার। কিন্তু বাকি তিনজনও এটা জেনে খুশি হলো যে, তারা একা নয়, তাদের মতো আরও অনেকেই আছে। ফলে খুব দ্রুতই তারা পরস্পরের বন্ধু হয়ে গেল। এরপর খুশি আপা আরো কিছু আত্মপরিচয়ের কার্ড তুলে পড়ে শোনালেন

আত্মপরিচয়ের কার্ড

আমি ঘুরে বেড়াতে খুব পছন্দ করি। সমুদ্র আমার খুব প্রিয়। আমার প্রিয় রং নীল। আমার ক্রিকেট খেলতে খুব ভালো লাগে। বড় হয়ে আমি ক্রিকেট খেলোয়াড় হতে চাই।

আমাদের মিল-অমিল

আত্মপরিচয়ের কার্ড থেকে প্রতিবারই দেখা গেল একসাথে অনেককেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে যাদের একই রকম বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তখন খুশি আপা সবার কাছে জানতে চাইলেন বার বার একটা আত্মপরিচয়ের কার্ড দিয়ে কয়েকজন একই রকম বৈশিষ্ট্যের বন্ধুদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে কেন? সবাই বলে উঠলো, কারণ আমাদের এক জনের সাথে অন্য জনের অনেক মিল রয়েছে। খুশি আপা বললেন, আচ্ছা এবার বলো তো এভাবে পরিচিত হয়ে তোমাদের কেমন লাগলো? নিসর্গ বললো, খুব ভালো লেগেছে। কারণ আমরা বুঝতে পেরেছি যে, বাইরে যত অমিলই দেখাক না কেন, আমাদের মাঝে আসলে অনেক বিষয়ে মিল রয়েছে। আর সবার সম্পর্কে এক সাথে অনেক জরুরি কথা জানতে পারলাম যা জানতে হয়তো আমাদের অনেক দিন লেগে যেতো। এরপর খুশি আপা বললেন, তাহলে প্রতিদিন ক্লাসের শুরুতে অবশিষ্ট কার্ডগুলো থেকে কিছু কিছু কার্ড নিয়ে পড়ে দেখবো।

আমি কে?

এ পর্যায়ে খুশি আপা সবার উদ্দেশ্যে বললেন যে, এতক্ষণ আমরা যা করলাম তার উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের পরিচয় তুলে ধরা। তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছো আমরা প্রত্যেকে অন্যের সামনে নিজেদের বিশেষ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। একজন মানুষ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এরকম নিজের বিভিন্ন পরিচয় তুলে ধরে। এসবই আমাদের আত্ম-পরিচয়ের একটা অংশ মাত্র। এরকম আরও অনেক বিষয় মিলে একটা সমাজের, জাতির মানুষের আত্মপরিচয় গড়ে ওঠে। তোমরা কি জানতে চাও আমাদের আত্মপরিচয় কীভাবে গড়ে উঠেছে? আজ আমরা যে কার্যক্রম শুরু করলাম এর ধারাবাহিকতায় সারা বছর ধরে আমরা আরও অনেক মজার মজার কাজ করবো। এটা একটা অভিযাত্রার মত। এই অভিযাত্রায় আমরা যেমন দেখবো সুদূর প্রাচীনকালে মানুষ কীভাবে প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে জীবন যাপন করেছে, সময়ের সাথে সভ্যতার বিকাশে ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি জানবো কীভাবে গড়ে তুলেছে পরিবার, সমাজ, আইন-কানুন, রাষ্ট্র প্রভৃতি। আর এসবের মধ্য দিয়েই পূর্ণতা পেয়েছে এই ভূখণ্ডের মানুষের আত্ম পরিচয়। খুশি আপা আনন্দের সাথে বললেন, আত্মপরিচয়ের ধারণাটিকে আরো গভীরভাবে বোঝার জন্য এখন থেকে আমরা ধাপে ধাপে অনেক মজার মজার কাজ করবো এবং শিখবো। চলো এবার শুরু করা যাক আমাদের এই অভিযাত্রা।

এরপর খুশি আপা, বোর্ডে আত্মপরিচয় শব্দটি লিখলেন এবং সবাইকে বললেন, এই শব্দটি দিয়ে কে কী বুঝেছ তা বলো। শুভ বললো, আত্মপরিচয় হচ্ছে এমন একটি বিষয় যার মাধ্যমে "আমি কে?" এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়। আর মিলি বললো, আমরা এতক্ষণ কার্ডে নিজেদের সম্পর্কে যা লিখেছি তা এই আত্মপরিচয়েরই অংশ মাত্র।

খুশি আপার মতো করে আত্মপচিয়ের কার্ডের খেলাটি চলো আমরা আমাদের এলাকার বন্ধুদের সাথেও খেলি।

এ পর্যায়ে স্বাধীন প্রশ্ন করলো যে, আমরা যেমন করে আমাদের পরিচয় তুলে ধরতে চেষ্টা করলাম অন্যরাও কি একই ভাবে "আমি কে?" এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে? জবাবে খুশি আপা বললেন, এ প্রশ্নের উত্তর পেতে চলো আমরা সহপাঠীদের যে কোনো একজনের আত্মপরিচয়ের একটি ছক তৈরি করবো। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে স্বেচ্ছায় আত্মপরিচয় জানাতে চাও? শুনে রুমানা বললো—আমি চাই আপা। আলোচনা করে রুমানার আত্মপরিচয়ের ছক তৈরি করবে। তখন ঠিক হলো সবাই প্রশ্ন করবে এবং খুশি আপা বললেন, সেটা তো খুবই ভালো কথা। চলো আমরা প্রথমে রুমানার পরিচয়ের ছক তৈরি করে অনুশীলন করি। তারপর সবাই মিলে নিচের মতো করে রুমানার পরিচয়ের ছক তৈরি করলো।

চলো আমরা অনেক পরিচয়ে রুমানাকে চিনে নিই –

রুমার পরিচয়ের ছক

খুশি আপা বললেন দ্যাখো, রুমানার আঠারোটা পরিচয় বেরিয়ে গেল। ইচ্ছা করলে আরও পরিচয় বের করতে পার। যেমন ও মুসলিম আর ওর দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মধ্যে রেখা হিন্দু, সুবর্ণা বৌদ্ধ ও বই কেনে এবং পড়তে ভালোবাসে এমনি আরও।

ফাতেমা বললো, চলো এবার আমরা আমাদের আত্মপরিচয়ের ছক তৈরি করি। সে আরো বললো মানুষের পরিচয়ের এই খেলা থেকে একটা জিনিস বুঝলাম — আমাদের কেবল একটা করে পরিচয় নয়। একটা ভালো নাম, সঙ্গে হয়তো একটা ডাক নাম আমাদের দেওয়া হয়েছে জন্মের কিছু পরে। আমাদের অন্যান্য পরিচয় তখন প্রকাশ পায় নি। নাম যেন সুটকেসের হাতলের মতো, ওটা তোলার জন্য লাগে, নাম লাগে ডাকার জন্য। সুটকেসের ডালা খুললে ভেতরে দেখতে পাও কত জিনিস আছে। তেমনি তোমার নিজের গল্পের ডালা খুললে বেরিয়ে আসবে তোমার অনেক পরিচয়।

এ হলো পরিচয়ের ডালা খোলার খেলা।

আমার আত্মপরিচয়

পরের দিন খুশি আপা, সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, যে তোমরা এখন মানুষের আত্মপরিচয়ের মৌলিক উপাদানগুলো চিহ্নিত করার যোগ্যতা অর্জন করেছো। অনুভব বললো, হ্যাঁ আপা, রুমানার আত্মপরিচয়ের ছক তৈরির অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে আমরা নিজেদের আত্মপরিচিতি পত্র তৈরি করব। মিলি বললো, সেই সাথে কয়েকজন বরেণ্য মানুষ, যেমন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বেগম রোকেয়া, আর বিজ্ঞানী নিউটনের পরিচিতি পত্রও তৈরি করতে চাই।

বিখ্যাত মনীষীদের পরিচয়ের ছক তৈরি করি

এবার বিখ্যাত মনীষীদের পরিচয়ের ডালা খোলার পালা। চলো প্রথমে আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংক্ষিপ্ত জীবনীটা পড়ে সেখান থেকে তার পরিচয়ের ছক তৈরি করে একটু অনুশীলন করে নেই। নিচে দেয়া বঙ্গবন্ধুর জীবনীটা দলে ভাগ হয়ে দ্রুত পড়ে নিই আর পরিচিতিসূচক শব্দগুলোর নিচে দাগ দিয়ে রাখি। সেগুলো তাঁর পরিচয়ের ছক তৈরিতে সাহায্য করবে। ছক তৈরি হয়ে গেলে ওরা গলগতভাবে সেগুলো উপস্থাপন করলো এবং দৃশ্যমান জায়গায় টানিয়ে দিলো। সবশেষে মনীদের পরিচয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা বা আলোচনা করলো

ছেলেবেলার মুজিব

১.

শেখ মুজিবুর রহমান। এই নামটি তুমি জানো। অনেকবার শুনেছো। তাঁর অনেক ছবিও নিশ্চয় দেখেছো। একটি ছবি বেছে নিয়ে বড়দের সাহায্যে বাঁধিয়ে নিতে পার।

সেটা তোমার পড়ার টেবিলে রাখতে পার। সামনের দেওয়ালেও টাঙাতে পার। অথবা বাসার কোনো সুন্দর জায়গায় ঝুলিয়ে দিতে পার।

মানুষ ভালোবেসে তাঁকে ডাকে বঙ্গবন্ধু। তাই আমরা বলি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তুমি বঙ্গবন্ধুর যে ছবিটা বাছাই করেছ তার নিচে ঠিকভাবে তাঁর নাম এবং দুটি তারিখ লিখবে – ১৭ই মার্চ ১৯২০ – ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫।

এ দুইটি তারিখ কেন বলো তো? হয়তো অনেকেই আন্দাজ করতে পারছো, প্রথমটি জন্ম তারিখ ও সাল আর দ্বিতীয়টি মৃত্যু তারিখ ও সাল।

তিনি আমাদের জাতির পিতা।

আমরা তাঁকে কেন জাতির পিতা বলি জানো?

তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন, কখনও ভয় পেয়ে পিছু হটেন নি, ওদের সাথে মন্ত্রিত্ব বা কোনো কিছুর বিনিময়ে আপোস করেন নি । তিনি নিজের জন্যে কখনও কিছু চান নি, এমনকি নিজের জীবনের পরোয়া করেন নি। ওদের ষড়যন্ত্র, নির্যাতন, মামলা কিছুতেই তিনি টলেন নি। এমন নেতা এদেশের মানুষ আগে কখনও দেখে নি। তাই সবাই তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিল। জান তো বাঙালি আগে কখনও যুদ্ধ তেমন করে নি। তিনিই আমাদের সবাইকে এক করলেন আর বীরের জাতিতে পরিণত করলেন। বঙ্গবন্ধু না হলে এমনটা হত না, তিনি নয়তো কে জাতির পিতা হবেন?

চলো আজকে আমরা সে মানুষটা ছেলেবেলায় কেমন ছিলেন সে গল্পটা শুনি

২.

টুঙ্গিপাড়া – বাংলাদেশের একটা গ্রাম। সে গ্রামে একটি নদী আছে – মধুমতি। ধানক্ষেত, পুকুর, দিঘি, বিল আর ঝোপঝাড় বনবাদাড় নিয়ে সে নিভৃত বাংলার শান্ত এক গ্রাম। আর দশটা গাঁয়ের মতো সেখানেও মাছ পাওয়া যেত প্রচুর, পাখির কলকাকলিতে থাকত মুখর। গরু-বাছুর চড়ত মাঠে। পাড়ায় কিছু দালান, মাটির দাওয়া টিনের ছাউনি ঘর, বাঁশ-বেড়ার ঘর, ভ্যান্না পাতার ছাউনি কুঁড়েঘরও ছিল। ছিল না পাকা রাস্তা, বিদ্যুৎ, গাড়ি। লোকে চলাচল করত পায়ে হেঁটে। আর ছিল নৌকা – নানা রকম।

এই গাঁয়ে ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ শেখ লুৎফর রহমান ও সায়েরা খাতুনের এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। প্রথম সন্তান, তাই পরিবারে আনন্দের ঢেউ।

নাম রাখা হয় মুজিবুর রহমান, বংশের উপাধি শেখ থাকবে নামের আগে। বাবা-মায়ের মুখে মুখে ডাকনাম

হয়ে গেল খোকা। ছোট খোকা বড় হচ্ছে মায়ের সাথে গ্রামে, টুঙ্গিপাড়ায়। ছোটবেলা থেকেই খেলাধূলায় ঝোঁক ছেলেটির। তার ছিল ছোটদের দল। খোকাই তাদের নেতা। কারো গাছের আম পেড়ে খায়, কারো গাছের ফুল তুলে নেয়, আর থেকে থেকে তারা দল বেঁধে খেলায় মেতে ওঠে। একসময় ফুটবল খেলতে শুরু করে। খোকা বেশ ভালোই খেলে।

গ্রামের স্কুলেই ভর্তি করে দেওয়া হয় শিশু মুজিবকে। এখানে তৃতীয় শ্রেণির পাঠ শেষ করার পরে বাবা তাকে নিয়ে আসেন গোপালগঞ্জ শহরে, নিজের কাছে রেখে পড়াবেন। বলা হয় নি বুঝি, বাবা লুৎফর রহমান এখানে সরকারি অফিসে কেরানি। বলা হয় সেরেস্তাদার – ফার্সি শব্দ। এক কালে ফার্সি ছিল রাষ্ট্রভাষা – মানে সরকারের অফিস-আদালতের ভাষা।

এবার মুজিব চলল গোপালগঞ্জ শহরে, হাইস্কুলে পড়বে। সারাক্ষণের বন্ধুদল আর অতিচেনা গাছপালায় ছাওয়া পুকুর-বিল ঘেরা মায়ের গন্ধমাখা টুঙ্গিপাড়ার মায়াভরা দিন পিছনে ফেলে মুজিব এল গোপালগঞ্জ শহরে। ভর্তি হলো গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলের ক্লাস ফোরে। থাকে বাবার সাথে।

বাবার হাত ধরেই সপ্তাহের ছুটিতে আর স্কুলের লম্বা বন্ধের সময় ফেরে গাঁয়ে মায়ের কোলে। মাকে ছেড়ে চেনা পরিবেশ ছেড়ে থাকতে কষ্ট হলেও একসময় সয়েও গেছে। নতুন জায়গায় নতুন নতুন বন্ধুও হয়েছে।

শিশু মুজিব কিন্তু মোটেও কেবল পড়া আর পরীক্ষা নিয়ে সময় কাটিয়ে দেয় নি। নানা দিকে তার উৎসাহ – খেলাধূলায় সবচেয়ে বেশি। তার মধ্যে ফুটবল সবার উপরে। বড় হয়ে ঐ সময়ের কথা তিনি নিজেই লিখেছেন –ছোট সময়ে আমি খুব দুষ্ট প্রকৃতির ছিলাম। খেলাধুলা করতাম, গান গাইতাম, এবং খুব ভাল ব্রতচারী করতে পারতাম।

ভাবো তো, আমাদের বঙ্গবন্ধু গানও গাইতে পারতেন। তিনি যে বরাবর গান পছন্দ করতেন সে পরিচয় আমরা পরেও পেয়েছি। তোমরা তাঁর লেখা ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ পড়লে এছাড়াও তাঁর জীবনের আরও অনেক কথা জানতে পারবে। বড় হয়ে অবশ্যই পড়বে।

৩.

কিন্তু হঠাৎ ছন্দপতন। প্রাণবন্ত শিশুটা হঠাৎ করেই এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হলো – বেরিবেরি। রোগের নামটা মজার, কিন্তু স্বভাবটা খারাপ। সবাই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল, এ সময় লেখাপড়া বন্ধ করে দু’বছর তাঁর চিকিৎসা চলে। ডাক্তার দেখাতে কলকাতা যেতেন আর বাকি সময় গাঁয়ে মা আর ফুফুদের সেবায় ভালো হয়ে উঠতে থাকেন। দুইবছরের চিকিৎসায় বেরিবেরি থেকে ভালো হলেও এবার দেখা দিল গ্লুকোমা, চোখের অসুখ। আগের রোগে হার্ট দুর্বল হয়েছে, এবারে চোখের দৃষ্টি কমে গেল। চিকিৎসা চলল আবারও কলকাতায়। এই মহানগরীই তখন অবিভক্ত বাংলার রাজধানী। ভালো ডাক্তার, হাসপাতাল, বাজার-সওদা, স্কুল-কলেজ সব কিছুর কেন্দ্র তখন কলকাতা।

অসুখের কারণে লেখাপড়ায় বেশ পিছিয়ে পড়তে হলো। ১৯৩৬ সালে আবার স্কুলে ফেরা। এবারে মাদারীপুর হাইস্কুলে, কারণ ততদিনে বাবা লুৎফর রহমান বদলি হয়ে গেছেন মাদারীপুরে। এখানেও তিনি সেরেস্তাদার অর্থাৎ আদালতের প্রধান কেরানি। কিন্তু এসময় মুজিবের চোখের অসুখ আবার বেড়ে গেল। কলকাতার ডাক্তার অপারেশন করতে বললেন। বলেছেন তাড়াতাড়ি না করলে অন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। তাই দ্রুতই

দুই চোখের অপারেশন করতে হলো। ভালো হয়ে চশমা নিতে হলো এবং সেই ১৫/১৬ বছর বয়স থেকে তাঁকে সবসময় চশমা পরতে হয়েছে।

এভাবে লেখাপড়া আবার ঠিকভাবে শুরু করতে করতে ১৯৩৭ সাল এসে গেল। বালক মুজিব পুরোনো স্কুলে আর যেতে চাইল না। বন্ধুরা যে তাকে পেছনে রেখে এগিয়ে গেছে। এই সময় কিছুদিন তার বাসায় পড়ার ব্যবস্থা হলো। কাজী আবদুল হামিদ নামে এমএসসি পাশ একজনকে মাস্টার হিসেবে বাড়িতেই রেখে দিলেন বাবা। সেকালে এমন ব্যবস্থা প্রায় সব শিক্ষানুরাগী পরিবারেই ছিল। হামিদসাহেব পড়ানোর পাশাপাশি গরিব ছাত্রদের সহায়তা দেওয়ার জন্যে 'মুসলিম সেবা সমিতি' গড়ে তুললেন। সেকালে মুসলমানরা একটু পিছিয়ে ছিল। বেশির ভাগ মানুষ ছিল গরিব চাষি, লেখাপড়ার খবরই রাখত না, ছেলেমেয়েদের পড়ানোর সঙ্গতিও ছিল না।

বালক মুজিব এবং আরও ছেলেরা মিলে বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল সংগ্রহ করত। সেই চাল বিক্রি করে গরিব ছাত্রদের বই-খাতা দেওয়া হতো, পরীক্ষা ও অন্যান্য খরচ দিয়েও সাহায্য করা হতো। হায়, কী দুর্ভাগ্য হঠাৎ করেই অসুখে ভুগে শিক্ষক হামিদসাহেব মারা যান। কিন্তু তাঁর যোগ্য শিষ্য মুজিব আছে না! ততদিনে বালক মুজিব পরের জন্যে খাটায় উৎসাহ পেয়ে গেছে।

খেয়াল করেছ বালকের কয়েকটি বিশেষ গুণ – তার সাহস ছিল, গরিবের প্রতি ছিল দরদ, নেতা হওয়ার গুণ ছিল এবং দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠা ছিল প্রবল। হয়ত কখনও কখনও একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলত, কিন্তু পরে নিজেই ভুল বুঝতে পারত। বয়সও তো কম ছিল তখন।

৪.

১৯৩৮ সালের ঘটনাটা না বললেই নয়। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে সর্বপ্রথম জনগণের মন জয় করতে পেরেছিলেন বরিশালের এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২)। তাঁকে মানুষ সম্মান করে ডাকত শের-এ-বাংলা অর্থাৎ বাংলার বাঘ। লম্বা চওড়া মানুষ। তিনি তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী। আর শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩)– আরেকজন বড় মাপের নেতা, তখন শ্রমমন্ত্রী। ঠিক হলো নেতাদের নিয়ে বড় করে সভার আয়োজন হবে। সঙ্গে থাকবে একটা প্রদর্শনী, এতে দোকানপাটের সঙ্গে জেলার কৃষি আর কুটির শিল্পের নমুনাও থাকবে। যারা এসব আয়োজন করবে, দেখাশুনা করবে সেই স্বেচ্ছাসেবকদের নেতা হলেন শেখ মুজিব।

সব ভালোভাবে হয়ে গেল। সভা শেষে নেতাদের বিদায় দেওয়ার সময় মুজিব সামনে এগিয়ে এসে দুই নেতাকে স্কুলের ছাত্রাবাসের ছাদ মেরামত করে দেওয়ার দাবি জানালো। কারণ বর্ষায় ছাদের ফুটো দিয়ে পানি পড়ে, ছাত্রদের খুব অসুবিধা হয়। তাঁর শিক্ষকরা তো ছাত্রের সাহস দেখে তাজ্জব, ভয়ও পেয়েছিলেন নেতারা কিছু মনে করেন কিনা এই ভেবে। কিন্তু প্রকৃত নেতা হয়ত এই তরুণের মধ্যে ভবিষ্যতের নেতার গুণই দেখতে পেয়েছিলেন।

খেলাধূলা আর কাজকর্মে ডুবে থাকতে থাকতেই চলে এলো স্কুলপর্ব শেষে আজকের এসএসসির মতো সেকালের প্রবেশিকা বা ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময়। ১৯৪১ সালে ম্যাট্রিক পাশ করলেন মুজিব। তারপরে কলেজের পড়া। পাড়ি দিলেন কলকাতায়।

আমার আত্মপরিচয়ের ছক তৈরি করি

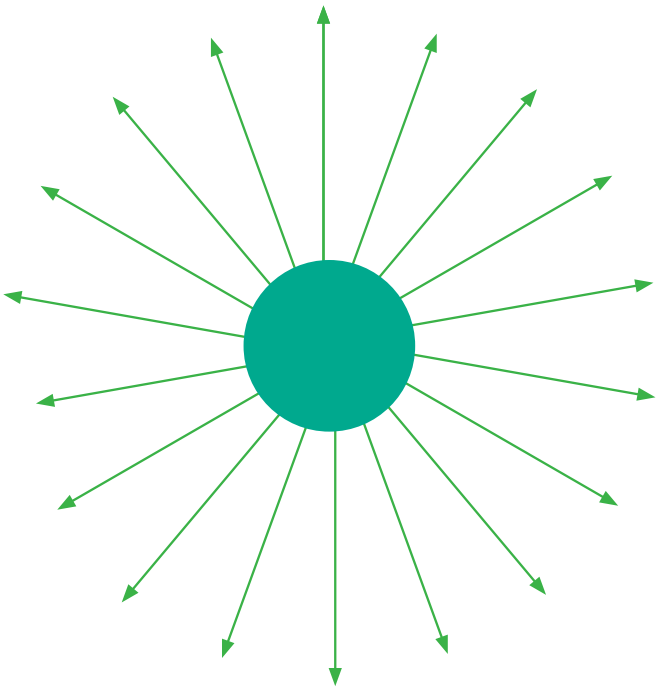

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন: নারী জাগরণের দিশারী

মেয়েরা ঘরের ভেতর বন্দি হয়ে আছে, তাদের লেখাপড়া করার সুযোগ নেই, বাইরের পৃথিবীর সাথে নেই কোনো রকম যোগাযোগ, ছোট্ট ঘরটাই তাদের কাছে পৃথিবী—এমনটি কি এখন ভাবা যায়? অথচ এক সময় এটাই ছিল স্বাভাবিক। মেয়েদের জীবন ছিল নিষেধের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। এমনই এক অসহনীয় সামাজিক পরিবেশে জন্ম বেগম রোকেয়া সাখওয়াত হোসেনের , ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বরে।

রোকেয়া জন্মেছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারে। রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে ছিল তাঁদের বিশাল জমিদার বাড়ি। প্রাচীরঘেরা এই বাড়িটি ছিল প্রায় সাড়ে তিনশ বিঘা এলাকা জুড়ে। রোকেয়ার বাবা জহিরুদ্দিন মুহম্মদ আবু আলী সাবের ছিলেন এই বংশের শেষ জমিদার। রোকেয়ার মায়ের নাম ছিল রাহাতুন্নেসা চৌধুরী। তাঁদের পাঁচ সন্তানের মধ্যে বেগম রোকেয়া ছিলেন চতুর্থ। বাড়িতে সবাই তাঁকে রুকু বলে ডাকতো।

জমিদার পরিবারে প্রচুর ঐশ্বর্যের মধ্যে বড় হচ্ছিলেন রোকেয়া। তাঁদের পরিচর্যার জন্য ছিল পরিচারিকার দল। তবুও তাঁর ছেলেবেলাটা মোটেই আনন্দের ছিল না। এমন খাঁচায় বন্দি পাখির জীবন কারই বা ভালো লাগে? শুধু যে ছেলেদের সামনে বের হওয়া বারণ তা নয়, পরিবারের বাইরে অন্য কোনো মহিলা বেড়াতে এলেও বড়রা চোখের ইশারায় সরে যেতে বলতেন। পরিবারে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা মানে শুধু কোরান শরিফ মুখস্থ করা।

বড় ভাই ইব্রাহিম সাবের কবিতা আবৃত্তি করতেন চমৎকার। রোকেয়ার বড় বোন করিমুন্নেসার লেখাপড়ায় ছিল দারুণ উৎসাহ। ইব্রাহিম লুকিয়ে তাঁকে পড়াতেনও। এক সময় একথা জেনে গেলেন তাঁদের বাবা এবং বাইরের লোকজন। বাবা বাধ না সাধলেও ক্ষেপে গেল সমাজ। করিমুন্নেসার বিয়ে দেওয়াই মুশকিল হয়ে গেল। ব্যস, বন্ধ হয়ে গেল করিমুন্নেসার লেখাপড়া।

তারপরও রোকেয়াকে বাংলা বর্ণের সাথে পরিচয় করালেন করিমুন্নেসা। আর পরিবারের নিষেধ অমান্য করে রোকেয়াকে ইংরেজি শেখালেন বড় ভাই ইব্রাহিম। অনেক রাতে পুরো বাড়িটা যখন ঘুমিয়ে, তখন মোম জ্বালিয়ে ইব্রাহিম আর রুকু লেখাপড়া করতেন। এভাবেই বেগম রোকেয়া আরবি, ফারসি, উর্দুর পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি লিখতে ও পড়তে শিখেছিলেন। সকল বাধাবিপত্তি দূরে ঠেলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার এই ছিল শুরু।

রোকেয়ার বয়স যখন আঠারো তখন তাঁর বিয়ে হলো খান বাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সাথে। পেশায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাখাওয়াতের বয়স ছিল তখন চল্লিশ। বিহারের এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম হলেও সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় তিনি দারিদ্র্যকে জয় করেছিলেন। স্বভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। তিনি ছিলেন অবাঙালি, তবে হুগলি কলেজে বাঙালি সহপাঠীদের কাছে বাংলা শিখেছেন। আদর্শ চরিত্রের সাখাওয়াতকেই রোকেয়ার স্বামী হিসেবে সকলের পছন্দ হলো।

বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে তিনি চলে এলেন ভাগলপুরে। এখানেও মুসলিম মেয়েদের দুরবস্থা রোকেয়াকে ভীষণ কষ্ট দিল। তিনি অনুভব করলেন, মেয়েরা যদি শিক্ষার আলো না পায় তাহলে কখনও তারা এই শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারবে না। এ ব্যাপারে তিনি স্বামীর সাথে প্রায়ই আলাপ করতেন।

স্বামীর সহযোগিতা পেয়ে রোকেয়ার ইংরেজি ভাষাচর্চায় যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। ইংরেজিতে অনেক মূল্যবান বই ও সাময়িকপত্র তিনি রোকেয়াকে পড়তে দিতেন। ফলে স্বামীর সরকারি কাজেও রোকেয়া সাহায্য করতে পারতেন। বিয়ের পর দুই কন্যা সন্তানের মা হয়েছিলেন রোকেয়া। কিন্তু অল্প বয়সে মারা যায় সন্তান দুটি।

সাংসারিক কাজের ফাঁকে লিখলেন ইংরেজিতে ‘Sultana's Dream’ নামে একটি কাহিনি। সাখাওয়াত হোসেন সেই লেখা পাঠিয়ে দিলেন একটি সাময়িকপত্রে এবং কোনো ধরনের পরিমার্জনা ছাড়াই তা ছাপা হলো।

এ সময় সাখাওয়াত হোসেনের শরীর খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না। তাঁর মন বললো, হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হলে রোকেয়া খুব নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বেন।

এ থেকেই সাখাওয়াত একটি মেয়েদের-স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা ভাবলেন এবং তাঁর সঞ্চিত অর্থ থেকে দশ হাজার টাকা আলাদা করে রাখলেন স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য। এর কিছুদিন পর ১৯০৯ সালের ৩রা মে তিনি মারা যান।

স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ মাস পর ভাগলপুরেই বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠা করেন ‘সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল’। শুরুতে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল পাঁচ। তবে পারিবারিক কিছু জটিলতার কারণে তাঁকে ভাগলপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসতে হলো। এখানেই ১৩ নম্বর ওয়ালিউল্লাহ লেনে ১৯১১ সালের ১৬ মার্চ থেকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা পেল ‘সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল’। ৮ জন ছাত্রী নিয়ে শুরু করলেও ক্রমে ছাত্রী সংখ্যা বাড়তে লাগল।

রোকেয়ার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি ছিল না। তারপরও তিনি স্কুলের কাজে কোনো ত্রুটি হতে দেন নি। তিনি বলেছেন, ‘শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই নয়, বালিকাদিগকে নানাভাবে দেশ ও জাতির সেবায় এবং পরোপকারব্রতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলাও আমাদের প্রধান একটি উদ্দেশ্য।’

স্কুল চালানোর পাশাপাশি অব্যাহত ছিল রোকয়োর সাহত্যি চর্চা। তিনি একাধারে কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ লিখেছেন। সবখানেই সত্য ও ন্যায়ের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। প্রবন্ধ লিখে তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ও কড়া ভাষায় নারী সমাজরে ওপর যে অন্যায় জুলুম করা হয় তার সমালোচনা করেছেন।

১৯১৬ সালে তিনি আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম বা মুসলিম মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রে মেয়েদের ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করা।

নারী শিক্ষাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন বেগম রোকেয়া। তাঁর রচিত সাহিত্যেও তিনি এই আদর্শেরই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তিনি বারবার বলতে চেয়েছেন, নারী সমাজকে জাগতে হবে, নইলে মুক্তি নেই। তাঁর আরেকটি আদর্শ ছিল সত্যনিষ্ঠা। তিনি বলেছেন, ‘সত্য প্রিয় হোক, অপ্রিয় হোক, সত্যকে বুঝব, খুঁজব এবং গ্রহণ করব।’

১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর। সেদিন ছিল রোকেয়ার ৫২তম জন্মবার্ষিকী। খুব সকালে তিনি ঘুম থেকে উঠে ওজু করলেন। হঠাৎ বুকে ব্যথা হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তা নিল প্রচন্ড রূপ। এক সময় তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

রোকেয়া চলে গেছেন, কিন্তু রেখে গেছেন তাঁর আদর্শ। সে আদর্শ নারী সমাজের উন্নতির আদর্শ। নারী সমাজের উন্নতির জন্য প্রয়োজন আত্মমর্যাদাবোধ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, জ্ঞান আর সাধনা। একমাত্র শিক্ষাই নারীকে এনে দিতে পারে এই অর্জন।

লাস্ট বয় থেকে সেরা বিজ্ঞানী

গ্রামের বাইরে শীতের বিকেলে স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার নামে। সেই অন্ধকারে একটি ছেলে চেষ্টা করছে ঘুড়ি ওড়াতে। কাঠি আর কাপড়ের তৈরি ঘুড়ি – ছেঁড়া কাপড় জোড়া দিয়ে দিয়ে তার আবার বিরাট লম্বা লেজ। শুধু তাই নয়, সেই লেজের আগায় ঝোলানো ছোট্ট একটি আলো।

ছেলেটি ভাবছে, যদি ঘুড়ি আকাশে ওড়ে, তখন আলো দেখে সবাই হয়তো ভাববে, বুঝি একটি নতুন তারাই উঠল আকাশে। কেউ হয়তো ভাববে, এটা রোজ কেয়ামতেরই পূর্বলক্ষণ। ছেলেটি ভাবে আর তার ঠোঁটের কোনায় দুষ্টু হাসি খেলে যায়।

কিন্তু সে ঘুড়ি কি আকাশে ওড়ে? আলোর ভারে লেজ তার পড়েছে ঝুলে। যতবারই সুতো ধরে টানে, ততবারই ঘুড়িটা গোত্তা খেয়ে মাটিতে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তাকে হাল ছেড়ে দিতে হয়।

কথাটা কেমন করে গ্রামের আরও দুচারজন লোকের কানে গিয়ে ওঠে। যারা শোনে, তারা বলাবলি করে: যেমন ব্যাটা আহাম্মক আমাদের বোকা বানাতে গিয়েছিল, তেমনি তার উচিত ফল হয়েছে। মূর্খটা এসব পাগলামি রেখে মাস্টারের কথামতো স্কুলের পড়া পড়লেই তো হতো।

এসব কথা ছেলেটি বড় হয়ে নিজেই তার আত্মজীবনীতে লিখে গেছে। বিলেতের স্কিলিংটন বলে একটি জায়গায় গ্রামের স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণিতে সে ছিল লাস্ট বয়। মাস্টাররা রায় দিয়েছিল এর মাথায় গোবর ছাড়া আর কিছু নেই। সহপাঠীরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করত।

কিন্তু বড় হয়ে সেই ছেলেটিই এমন সব আবিষ্কার করে বসল—যা দেখে দুনিয়ার সব বড় বড় বিজ্ঞানীরা থ' খেয়ে গেলেন। তাকে গুরু বলে মানলেন। তাঁকে করা হলো বিলেতের পার্লামেন্টের সদস্য, সম্রাট তাঁকে ভূষিত করলেন 'নাইট' বা 'স্যার' উপাধি দিয়ে। পণ্ডিতদের সেরা প্রতিষ্ঠান রয়্যাল সোসাইটি তাঁকে সভাপতি নির্বাচিত করলেন। সেই ছেলেটির নাম ছিল আইজাক নিউটন।

নিউটনের জন্ম হয়েছিল ১৬৪২ সালের ২৫শে ডিসেম্বর। বাপ ছিলেন কৃষক, নিউটন জন্মাবার আগেই তিনি মারা যান। গাঁয়ের স্কুলেই ছোটবেলায় পড়াশোনা, কিন্তু পড়ার চেয়ে সূর্যঘড়ি, জলঘড়ি, এমনিতরো কলকব্জা নিয়ে নাড়াচাড়ার ঝোঁকই তাঁর বেশি দেখা যেত।

যখন তাঁর বয়স ষোল বছর, তখন একদিন বিলেতে ভীষণ ঝড় হয়। সে কী প্রচণ্ড হাওয়ার দাপট। বিলেতের ইতিহাসে এত বড় ঝড় খুব কমই হয়েছে। নিউটনের তখন একটা শখ ছিল, হাওয়ার বেগ মাপার। হাওয়ার

যখন দাপট খুব বেশি, এমনি সময় তিনি হঠাৎ বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। যে দিকে হাওয়ার প্রবাহ, সেদিকে দিলেন এক লাফ; যেখানে পা গিয়ে পড়ল, সেখানে দিলেন একটা দাগ। তারপর ঠিক উল্টো দিকে দিলেন আর এক লাফ, আর মাটিতে দিলেন আরেক দাগ। পাড়া-প্রতিবেশীরা জানালার ফাঁক দিয়ে দেখল এই পাগলের অবাক কাণ্ড।

আত্মীয়-স্বজন ভেবেছিল, কৃষকের ছেলে কৃষকই হবে। কিন্তু ছেলের ঝোঁক বিজ্ঞানের বই যোগাড় করে পড়ার আর নানা রকম অদ্ভুত অদ্ভুত পরীক্ষা করার দিকে। একদিন বাজারে পাঠানো হয়েছে নিউটনকে; কয়েকটি ভেড়া, কিছু ডিম, আরো অন্যান্য জিনিস বিক্রি করে আসার জন্যে। কিন্তু তিনি আরেকটি লোককে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর হয়ে এগুলো বেচে দিতে; আর নিজে এক ঝোপের তলায় বসে মশগুল হয়ে পড়তে লাগলেন একটা অঙ্কের বই।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন তাঁকে সেখানে পাওয়া গেল, তখন তো বাড়িতে একটা রীতিমতো কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। কী করা যায়, এমন একটি অপদার্থ ছেলেকে নিয়ে? তাকে উদ্ধার করলেন এক চাচা। তিনি বললেন, দাও একে কলেজে পাঠিয়ে—সেখানে বসে যত খুশি অঙ্ক কষুক। তাই তাঁকে পাঠানো হলো কেমব্রিজে।

সত্যি সত্যি তিনি কলেজে গিয়ে অঙ্কে খুব ভালো করলেন। প্রথম বছরেই তিনি গণিতের এক নতুন ক্ষেত্র ক্যালকুলাস আবিষ্কার করে ফেললেন। লিখে রাখলেন সে সব। কিন্তু কাউকে বললেন না কিছুই। চাঁদের

চারদিকে মাঝে মাঝে চাকতির মতো আলোর প্রভা (চাঁদের সভা) দেখতে পাওয়া যায়। তা যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ভেসে থাকা পানির কণার ওপর আলো পড়ে তৈরি হয়, তাও তিনি এই কলেজের প্রথম বছরেই আবিষ্কার করলেন।

তেইশ বছর বয়সে নিউটন কলেজের পড়া শেষ করে গণিতের অধ্যাপক হলেন। কিন্তু পরের বছরই বিলেতে লাগল বিরাট রকম প্লেগের মড়ক। স্কুল-কলেজ সবই বন্ধ হয়ে গেল। কাজেই নিউটনও গ্রামে ফিরে গিয়ে তাঁর গবেষণার কাজে মন দিলেন। তাঁর মনে যত সমস্যা দেখা দিতে লাগল, গণিতের হিসেবে ফেলে তার সব কিছুর মীমাংসা করার চেষ্টা করতে লাগলেন। এই গ্রামে বসে বসে পঁচিশ বছর বয়স হওয়ার আগেই নিউটন তাঁর সমস্ত যুগান্তকারী আবিষ্কারের ভিত দাঁড় করালেন।

গ্রহেরা কী করে সূর্যের চারদিকে ঘোরে, এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন মহাকর্ষ তত্ত্বের।

গল্প আছে গাছ থেকে আপেল মাটিতে পড়তে দেখেই কথাটা তাঁর মাথায় এসেছিল। নিউটন ভাবলেন, গাছ থেকে আপেল যদি মাটিতে পড়ে তাহলে চাঁদ পৃথিবীতে না পড়ে শূন্যে ভেসে থাকে কী করে। তাঁর মনে হলো, চাঁদকেও নিশ্চয়ই পৃথিবীটা আকর্ষণ করছে, কিন্তু চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে বলেই সেটা পড়তে পারছে না অর্থাৎ পৃথিবীর আকর্ষণটা কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছে।

চাঁদ কত বেগে ঘুরলে পৃথিবীর আকর্ষণ কাটাকাটি হতে পারে নিউটন তা অঙ্ক কষে বের করলেন। আর আশ্চর্য! জ্যোতির্বিদরা চাঁদের ঘোরার যে বেগ হিসেব করেছিলেন তার সাথে তাঁর হিসেব হুবহু মিলে গেল। সবাই অবাক হয়ে দেখল নিউটনের মহাকর্ষের তত্ত্ব দিয়ে সারা বিশ্বের গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি হিসেব করা সম্ভব হয়ে উঠেছে।

আলোর দিকে ঝোঁক ছিল তাঁর বরাবর। আলো কী দিয়ে তৈরি—বাতির আলো, সূর্যের আলো, তারার আলো? নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করে তিনি আলো নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

গ্যালিলিও যে দুরবিন তৈরি করেছিলেন, তার কথা নিউটন জানতেন। দুরবিনের মধ্যে আলোর গতিবিধি তিনি গণিতের মাপজোকের সাহায্যে পরীক্ষা করলেন। তারপর এমন এক নতুন ধরনের দুরবিন তৈরি করলেন, যার ব্যাস ছিল মাত্র এক ইঞ্চি, আর যা লম্বায় ছিল দুইইঞ্চি। কিন্তু তাতে দূরের কোনো জিনিস দেখা যেত চল্লিশ গুণ বড়। এই দুরবিনের মাধ্যমে তাকিয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন বৃহস্পতির উপগ্রহদের। এরপর কাচের প্রিজম বা তেশিরা পরকলার সাহায্যে নিউটন দেখলেন সাদা আলোর মধ্যেই আছে সাতরঙা আলোর রঙধনু।

নিউটন ছিলেন খুবই সাদাসিধে রকমের মানুষ। সেকালের বিজ্ঞানীরা নতুন কিছু আবিষ্কার করলে সেটা সঙ্গে সঙ্গে লিখে প্রচার করতেন। কিন্তু নিউটনের এসব দিকে মোটেই মন ছিল না। নিত্য নতুন আবিষ্কার নিয়ে তিনি এমন মশগুল থাকতেন যে, সেসব কথা লিখে ছাপাবার তাঁর ফুরসতই হত না।

নিউটন গবেষণার কাজে কেমন আপনভোলা হয়ে যেতেন, সে সম্বন্ধে অনেক কাহিনি চালু আছে। একবার তাঁর বাড়িতে ছিল এক বন্ধুর খাবার নিমন্ত্রণ। বন্ধু এসে দেখেন নিউটন বাড়ি নেই। টেবিলে একটা রান্না করা মুরগি ঢাকনা চাপা দেওয়া রয়েছে। অপেক্ষা করতে করতে পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট করে দুইঘণ্টা কেটে গেল। এত দেরি দেখে বন্ধু মুরগিটি খেয়ে ফেললেন। থালায় শুধু হাড়গোড়গুলো পড়ে রইল। শেষটায় নিউটন ফিরলে খাবারের ঢাকনাটা খুলে বললেন: 'আমি ভেবেছিলাম এখনো রাতের খাবার খাই নি। কিন্তু এখন দেখছি আগেই খেয়েছি।' তারপর দুই বন্ধুর মধ্যে শুরু হলো দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক আলোচনার বৈঠক।

নিউটন নিজের সম্বন্ধে কী বলেছিলেন শুনবে? 'লোকে আমার সম্বন্ধে কী ভাবে, তা আমি জানি নে। কিন্তু নিজের কাছে মনে হয় যেন আমি ছোট শিশুর মতো সাগরের তীরে শুধু নুড়িই কুড়িয়ে বেড়ালাম। বিশাল জ্ঞানের সমুদ্র আমার সামনে অজানাই পড়ে রইল।'

চলো আমরাও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বেগম রোকেয়া আর বিজ্ঞানী নিউটনের জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক জেনে তাদের পরিচয়ের ছক তৈরি করি। বাসায় বা এলাকায় বন্ধুদের সাথে এটা নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা বা আলোচনা করি।

ব্যক্তিগত পরিচয়ের ছক

এবারে খুশি আপা ক্লাসে এক মজার ছবি দেখালেন। এটি গোল চাকতির মত ছক। ছকে নিজের পরিচয়ের জন্য আমাদের নিজেদের বিষয়ে অনেক কিছু লেখার জায়গা রয়েছে। ক্লাসের প্রত্যেকে নিজের বিষয়ে সেখানে লিখলো। হয়ে গেল সবার ব্যক্তিগত পরিচয়ের ছক।

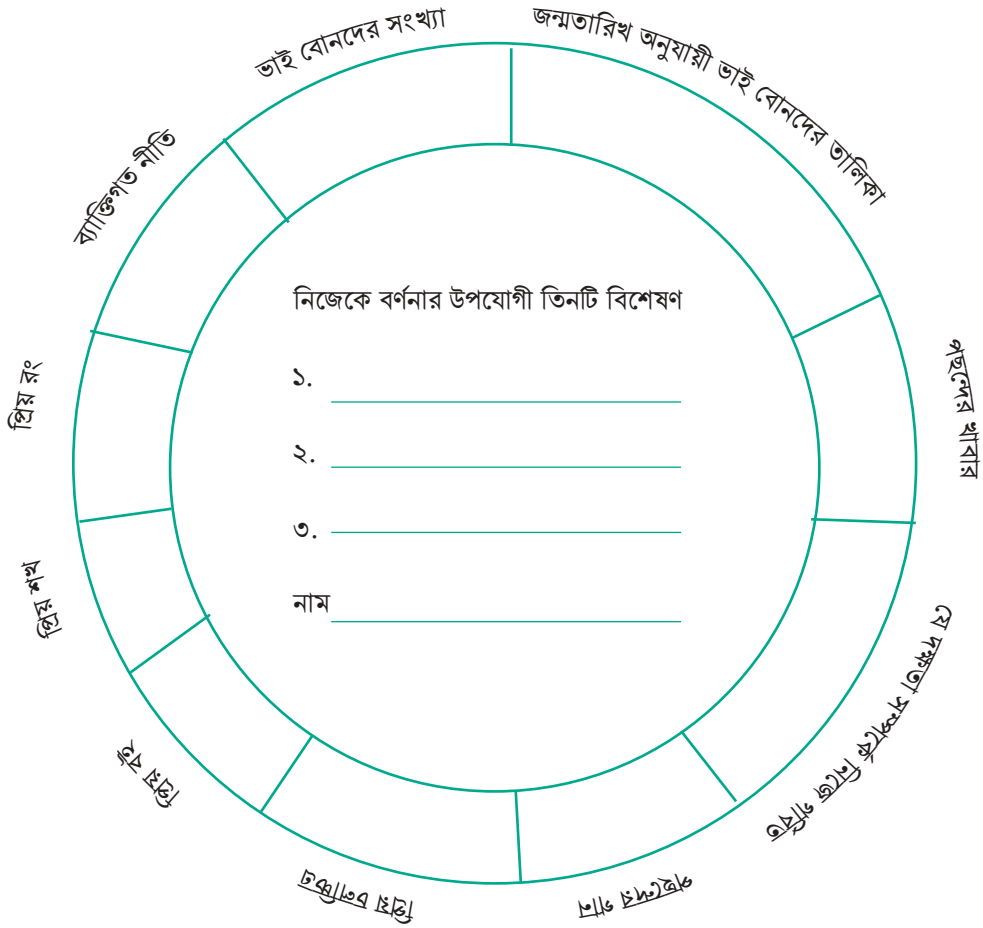

এ পর্যায়ে খুশি আপা ছক ও প্রশ্নের উত্তরগুলো নিয়ে সকলের অংশগ্রহণে একটি সাধারণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বললেন, দেখলে তো ব্যক্তিগত পরিচয় মানুষের শুধু দুই/একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে নয় বরং তা আসলে বহুমাত্রিক এবং এক একজন মানুষের আত্মপরিচয়ের ছক এক এক রকমের হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমাদের কাছের বন্ধুটির সাথে আমাদের যেমন মিল রয়েছে, তেমনি রয়েছে অমিল। অর্থাৎ আত্মপরিচয়ের ভিন্নতা সত্ত্বেও মানুষ অনেক ভালো বন্ধু হতে পারে।

আমরাও চলো আত্মপরিচয়ের ছকটি পূরণ করি, প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি এবং বন্ধুদের সামনে তুলে ধরি

আত্মপরিচয়: ব্যক্তিগত পরিচয় ও সংকট

পরদিন ক্লাসে খুশি আপা বললেন, চলো একটা সহজ কাজ দিয়ে শুরু করা যাক আজ।

আচ্ছা, ভেবে দেখো তো, আমরা কি নিজেকেই ভালোভাবে চিনি? 'নিজেকে চেনা' –একটা রীতিমতো খেলাই হতে পারে। তুমি ভাব আমাকে তো সব্বাই চেনে, জানে তো আমার নাম মামুন আসলে আমরা তো সবাই সব্বাইকে চিনি – ঐ তো শাহিন, ওদিকে রুমানা, ওটা গণেশ, দারুণ ফুটবল খেলে।

একটু থামো তো, গণেশকে কেবল নাম দিয়েই চেনো না, ও যে ভালো ফুটবল খেলে সেই গুণ দিয়েও তাকে চেনো। আমরা তো জানিই, নামের আড়ালে তোমাদের আরও পরিচয় লুকিয়ে আছে, সে একটা-দুটো নয় অনেক। সেগুলো সব মিলেই আত্মপরিচয়।

কখনও কখনও মানুষের আত্মপরিচয়ের সংকট হয়। ভাবছ সে আবার কেমন কথা! দুইভাবে হতে পারে এই সমস্যা। প্রথম হলো তুমি নিজেকে যা ভাব অন্যরা তা ভাবছে না। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় আমাদের নানা বিষয়ে ঝোঁক বা আগ্রহ থাকে। যেমন, ছবি আঁকা, খেলা, নাচ বা গান করা, কবিতা, গল্প-উপন্যাস পড়া, ইতিহাস, ঐতিহ্য চর্চা প্রভৃতি। কিন্তু আমরা বুঝতেই পারি না কোনটি হবে আমার চর্চার বা অনুশীলনের প্রধান ক্ষেত্র বা বিষয়।

প্রথম সমস্যার একটা চরম কিন্তু মজাদার দৃষ্টান্ত আছে বিদেশি একটি গল্পে। চলো গল্পটা আমরা পড়ে নিই –

যে ভালুকটি ভালুক ছিল না

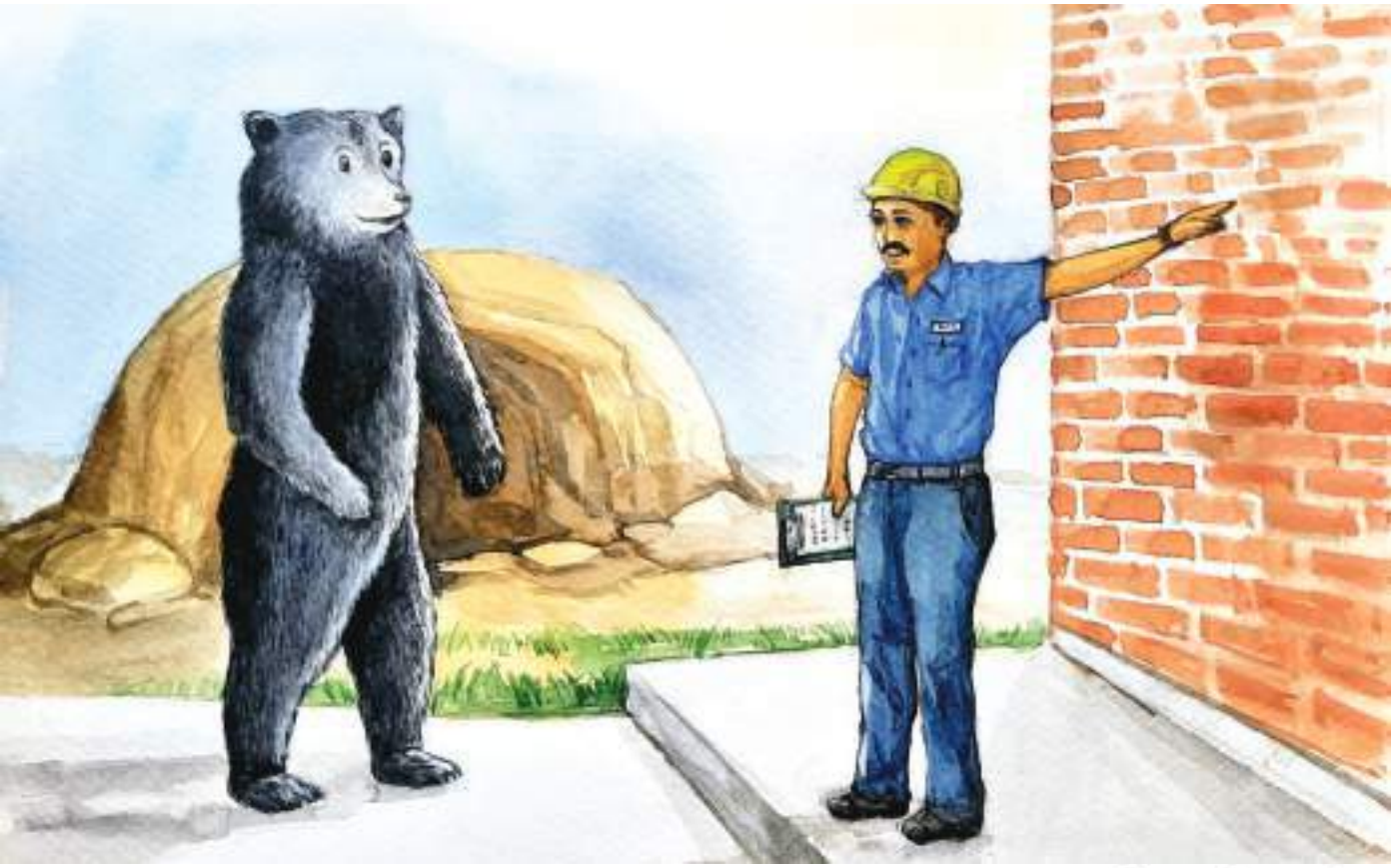

অনেক দিন আগের কথা, হ্যাঁ দিনটা ছিল মঙ্গলবার। ভালুক দেখল শীত আসছে, তাকে কোনো গুহায় গিয়ে লম্বা শীতঘুম দিতে হবে। যা ভাবা তাই সে করল। খুব বেশিদিন হবে না, দিনটা ছিল বুধবার, বিরাট এক কর্মীবাহিনী এলো গুহার কাছে। ভালুক যতদিন ঘুমোচ্ছিল তার মধ্যেই বিরাট একটা কারখানা তৈরি হয়ে গেল সেখানে।

শীত গিয়ে বসন্ত আসতেই ভালুকের ঘুম ভাঙল। সে গুহার বাইরে বেরিয়ে এলো। চারিদিকে তাকিয়ে ওর চোখ তো ছানাবড়া। আরে, বনটা গেল কই? ঘাসগুলোরই বা কী হলো? আর গাছপালা সব? ফুলগুলো? ব্যাপারটা কি? – কীভাবে ঘটল এ কাণ্ড!

'আমি বোধহয় স্বপ্ন দেখছি', ভালুক নিজেকে বলল, 'নিশ্চয় আমি স্বপ্ন দেখছি।' না, এটা মোটেও স্বপ্ন নয়। একেবারে বাস্তব ঘটনা। এমন সময় কারখানার ফোরম্যান বেরিয়ে এসে হাঁক দিয়ে বলল – 'এই-তুমি, যাও তাড়াতাড়ি কাজে যাও।'

ভালুক ঢোঁক গিলে বলল, 'আমি তো এখানে কাজ করি না। আমি তো ভালুক।'

শুনে ফোরম্যান হেসে ফেলল, 'হ্যাঁ কাজ ফাঁকি দেওয়ার জন্যে একটা মানুষের ভালো ছুতো বটে – (ব্যঙ্গ করে) আমি একটা ভালুক।'

ভালুক আবার বলল, 'কিন্তু আমি তো একটা ভালুক।'

ফোরম্যান এবার আর হাসতে পারল না, তার বরং পাগল হওয়ার উপক্রম, 'আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করবি না, সে বলল। তুই মোটেও ভালুক না। একটা বোকা হাঁদারাম মানুষ যার দরকার দাঁড়ি চাঁছা আর উদ্ভট পশমের কোট খোলা আছে। আমি তোমাকে ম্যানেজারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

ম্যানেজারও বলল, 'ভালুকটা একটা গবেট যার দরকার ভালো করে শেভ করা আর সে পরে আছে একটা পশমের কোট'।

ভালুক বলল, 'না, আপনার ভুল হচ্ছে। আমি ভালুকই।' শুনে ম্যানেজারও ভয়ানক চটে গেল।

ভালুকের কথা, 'আপনার এ কথা শুনে আমি খুব দুঃখ পেয়েছি, আমি একটা ভালুকই।'

কারখানার থার্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট তো আরও চটে গেলেন, দ্বিতীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট তো পাগল হওয়ার উপক্রম। তিনি মহা চটে গেলেন। প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট রেগে চিৎকার শুরু করে দিলেন, 'তুমি কোনো ভালুক নও। তুমি একটা বোকা মানুষ যার দরকার দাঁড়িগুলো চাঁছা। আর হ্যাঁ, তুমি পরে আছ একটা পশমের কোট। চলো, তোমাকে আমি প্রেসিডেন্টের কাছে নিয়ে যাবো।' ভালুক মিনতি করে বলল, 'আপনাদের ভয়ানক ভুল হচ্ছে, বুঝেছেন, কারণ যতটা আমার মনে পড়ে আমি সবসময়ই ভালুকই ছিলাম।'

তার এ কথাটাই ভালুক আবার বলল কারখানার প্রেসিডেন্টকেও।

প্রেসিডেন্ট উত্তরে বললেন, 'কথাটা বলার জন্যে ধন্যবাদ। তুমি ভালুক হতেই পার না। ভালুক থাকে চিড়িয়াখানায় অথবা সার্কাসে। তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে তুমি কীভাবে ভালুক হবে?'

ভালুকের এক কথা, ‘কিন্তু আমি একটা ভালুক।’

এবার প্রেসিডেন্ট গম্ভীর হয়ে বললেন, ‘তুমি শুধু বোকা মানুষ নও যার দাঁড়ি চাঁছা দরকার, যে পশমের কোট পরে আছ, তুমি একটা গোঁয়ারগোবিন্দ লোক। বেশ, আমি তোমাকে এক্কেবারে প্রমাণ করে দেব যে তুমি মোটেও ভালুক নও।’

প্রেসিডেন্ট মহোদয় তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্টদেরসহ ভালুকটাকে গাড়িতে তুললেন। তারা চলল শহরের চিড়িয়াখানায়। চিড়িয়াখানার ভালুকরা ওকে ভালুক বলে স্বীকার করল না, কারণ ভালুক হলে সে তো থাকত খাঁচায়।

ভালুক গরগর করে বলল, ‘আমি কিন্তু ভালুক।’

তো সবাই চিড়িয়াখানা থেকে চলল এবার কাছের সার্কাস দলের কাছে। প্রেসিডেন্ট মশাই সার্কাসের ভালুকদের জিজ্ঞেস করলেন, ‘এই দ্যাখ তো – এ ভালুক কিনা?

ভালুকরা সমস্বরে বলল, না, ও যদি ভালুক হত তাহলে ও তো মাথায় ছোট্ট হ্যাট পরত, ওর হাতে থাকত ফিতায় বাঁধা বেলুন আর ও চড়তো সাইকেল।

ভালুক জোর দিয়ে বলল, ‘না, আমি ভালুকই।

কারখানায় ফিরে এসে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টরা ভালুককে অনেক লোকের সাথে একটা বড় মেশিনে কাজে লাগিয়ে দিলো। বেচারা ভালুক ঐ বিশাল যন্ত্রে মাসের পর মাস কাজ করে গেল।

অনেক অনেক দিন পরে, কারখানাটা বন্ধ হয়ে গেল এবং সব লোকজন চলে গেল। ভালুক সবার শেষে বেরুল, বন্ধ কারখানা ছেড়ে বাইরে এসে সে দেখল হাঁসগুলো দক্ষিণে উড়ে যাচ্ছে, গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়ছে। সে বুঝল শীত আসছে। তার শীত ঘুমে যাওয়ার সময় এসেছে।

ভালুক একটা গুহা খুঁজে পেয়ে ঢুকতে গিয়ে একটু থমকে দাঁড়াল। ‘আমি তো গুহায় যেতে পারি না। আমি তো ভালুক নই। আমি এক বোকা মানুষ, যার শেইভ দরকার আর যে পশমের কোট পরে আছে।’

ঠান্ডা বাড়ছে, তুষার পড়তে শুরু করেছে, ভালুক ঠান্ডায় কাঁপতে লাগল। ‘আমি চাই আমি – আমি যদি ভালুক হতাম!’ ভালুক ভাবল।

তারপর হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল, তুষারের ওপর দিয়ে হেঁটে চলল গুহার দিকে। ভিতরটা আরামদায়ক এবং বেশ উম আছে। হিমশীতল বাতাস আর হাড়কাঁপানো শীত তার কাছে ঘেঁষতেই পারছে না। বেশ আরাম লাগছে তার। পাইনের ডালের বিছানায় সে গা এলিয়ে দিল আর শীঘ্রই মহাসুখে ঘুমিয়ে পড়ল আর মধুর স্বপ্ন দেখতে শুরু করল – ঠিক যেমনটা ভালুকরা শীতঘুমে দেখে। যদিও কারখানার ফোরম্যান, ম্যানেজার, থার্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট, দ্বিতীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট, এবং চিড়িয়াখানার ভালুকগুলো এবং সার্কাসের ভালুকগুলো বলেছে বটে সে একটা বোকাসোকা মানুষ যার দরকার দাঁড়িটা চাঁছা আর যে কিনা পরে আছে পশমের কোট। কিন্তু আমার মনে হয় না ভালুক ওদের কথা বিশ্বাস করেছে, তোমরা কি বিশ্বাস করেছ?

না, সে জানত যে সে বোকা মানুষ নয় এবং সে বোকা ভালুকও নয়।

খুশি আপা, কয়েকজনকে স্বেচ্ছায় এসে গল্পটির বিভিন্ন অংশ উচ্চস্বরে সকলের উদ্দেশ্যে পড়ে শোনানোর জন্য আহ্বান করলেন। গল্পটি পড়ে শোনানো শুরু হওয়ার আগেই খুশি আপা সকলকে ছবি আঁকার জন ছোট ছোট কক্ষ সম্বলিত নিচের ছকটি সরবরাহ করলেন। বললেন যে, গল্পটি পড়ে শোনানোর সময় সবাই গল্পের প্রতিটি অংশের মূল বিষয়বস্তু অনুযায়ী ছকে ছবি আঁকবে।

চলো গল্পটি পড়ে আমরাও নিচের ছকে গল্পের মূল অংশগুলোর ছবি আঁকি

গল্প থেকে ছবি আঁকি

ছবি আঁকার ছক:

শিক্ষার্থীরা গল্পটির প্রতিটি অংশের মূল বক্তব্য ছোট বক্সগুলোতে আঁকবে এবং নিচে শিরোনাম লিখবে

সমাজ কীভাবে মানুষের পরিচয়কে প্রভাবিত করে

এরপর খুশি আপা ভালুকের থাবা চিহ্ন- যুক্ত নিচের ছকটি সবাইকে দিলেন।

ভালুকের পরিচয়ের ছক তৈরি করি:

খুশি আপা বললেন, তোমরা ছকটি ব্যবহার করে ভালুকটি কোন কোন শব্দ দিয়ে নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে পছন্দ করে এবং অন্যরা ভালুকটির পরিচয় হিসেবে কোন কোন বিষয় মনে করে তার তালিকা তৈরি করবে। যে শব্দগুলো ভালুকটি নিজের পরিচয় হিসেবে পছন্দ করে সেগুলো ভালুকের থাবার ভিতরে এবং যে শব্দগুলো অন্যরা ভালুকের উপর আরোপ করতে চায় তা লিখবে থাবার বাইরে। সেই অনুযায়ী সবাই ছকটি ব্যবহার করে ভালুকের জন্য পরিচয়ের এই ছক তৈরি করলো।

ভালুকের গল্প নিয়ে আলোচনা:

খুশি আপা বললেন, এখন চলো আমরা এই গল্পটির অর্থ কে কী ভাবে বুঝলাম তা নিয়ে একটি আলোচনা করি। আলোচনা চলার সময় খুশি আপা নিচের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করলেন।

- ভালুকটি নিজের পরিচয় বর্ণনা করতে কোন কোন শব্দ ব্যবহার করতো?
- অন্যরা তার পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে কী কী শব্দ ব্যবহার করতো?
- সময়ের সাথে সাথে কীভাবে ভালুকটির পরিচয় পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল?
- ভালুকটিকে যখন পশমের কোট পরা বোকা মানুষ বলা হচ্ছিল তখন ভালুকটির কেমন লেগেছিলো বলে তোমরা মনে কর?
- গল্পের লেখক এখানে কী বোঝাতে চয়েছেনে?
- আমাদের পরিচয় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ? আমাদের পরিচয় সম্পর্কে আমরা কী ভাবি তাই, না কি অন্যরা আমাদের সম্পর্কে যা ভাবে তা?

তিনি বললেন, আশা করি, এই আলোচনা থেকে নিজের পরিচয় সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি অন্য মানুষও আমাদের পরিচয়কে কিভাবে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে তোমাদের একটি গভীর উপলব্ধি তৈরি হয়েছে। এরপর তিনি সবাইকে নিচের প্রশ্নগুলো করলেন-

- তুমি কি এমন কিছু মনে করতে পারো যখন তোমাকে কেউ কোন উপাধি/খেতাব বা তকমা দিয়েছে? তখন তোমার কেমন অনুভূতি হয়েছে? তুমি ঐ পরিস্থিতিতে কী আচরণ করেছো?
- এমন কি কখনো ঘটেছে যে তুমি অন্য কাউকে উপাধি/খেতাব বা তকমা দিয়েছো? দিয়ে থাকলে, কেন দিয়েছিলে?
- তোমার মতে আমরা কেন খুব দ্রুত আরেকজনকে উপাধি/খেতাব/তকমা দিয়ে দেই ?
- খুশি আপা বললেন চলো এক কাজ করা যাক আমরা আমাদের এই পরিচয়ের বিষয়ে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করি।
- বিতর্কের বিষয়: “আমি আমার পরিচয় সম্পর্কে যা ভাবি তাই আমার পরিচয় গড়ে তোলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ—অন্যরা কী ভাবলো তা নয়!”
- খুশি আপার ক্লাসের বন্ধুরা বিতর্কের বিষয়ের পক্ষে এবং বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে বির্তক করলো। দুই দল আলোচনা করে প্রতি দল থেকে একজন করে তাদের যুক্তি তুলে ধরলো।

চলো আমরাও উপরের প্রশ্নগুলো নিয়ে বন্ধুদের সাথে বির্তক বা আলোচনা করি।

এ অধ্যায় থেকে আমার শেখা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ-

-
-

মূল্যায়ন: আমরা কতটুকু শিখলাম?

নিচের সারণীতে বাম পাশে কিছু বিবৃতি রয়েছে। আর ডান পাশে রয়েছে ৪ মাত্রার একটি স্কেল। প্রতিটি বিবৃতি ভালোভাবে পড়ে বিবৃতির সাথে কতটা একমত বা ভিন্নমত পোষণ করছি তা নির্দিষ্ট ঘরে টিক চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করি এবং শিক্ষককে দেখাই-

আত্মপরিচয়: ব্যক্তিগত পরিচয় সংক্রান্ত মূল্যায়নের ছক

	সম্পূর্ণ একমত	একমত	ভিন্নমত	সম্পূর্ণ ভিন্নমত
১। সাদিয়া খুব ভালো ক্রিকেট খেলে, সে কবিতা পড়তে ভালোবাসে, তার স্বপ্ন সে একদিন বড় ক্রিকেটার হবে; সাদিয়া পানিতে নামতে খুবই ভয় পায়। তার প্রিয় রঙ নীল, তারা ৩ বোন, সে ফল খেতে ভালোবাসে-এসব কিছু মিলেই সাদিয়ার পরিচয়।				
২। মানুষের পরিচয় শুধু নির্দিষ্ট একটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।				
৩। নীলার প্রিয় খেলা দাবা আর স্যাব্বিরের প্রিয় ফুটবল। নীলার মা ডাক্তার আর সাব্বিরের মা আর্টিস্ট। নীলার কোনো ভাই বোন নেই, সাব্বিরের ২ ভাই এক বোন আছে। নীলা খুব ভালো সাঁতারু, সাব্বিরের পানিতে খুব ভয়। তাদের পরিচয় অনেক ভিন্ন ভিন্ন হলেও তারা ভালো বন্ধু হতে পারে।				
৪। পরিস্থিতির বা অবস্থানের পরিবর্তনে মানুষের কিছু পরিচয় আলাদাভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।				
৫। আমার ব্যক্তিগত পরিচয় অনেকগুলো বিষয় নিয়ে গঠিত।				
৬। আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ে যে যে বিষয়ই থাকুক না কেন, আমি আমার আত্মপরিচয় নিয়ে গর্ব অনুভব করি।				
৭। সুং মারমা ক্ষুদ্র নৃতাত্বিক গোষ্ঠির এক মেয়ে। সে আমার থেকে দেখতে বেশ ভিন্ন। সে যে খাবার খায় সেটি আমি যে খাবার খাই তা থেকে ভিন্ন। সে মারমা ভাষায় কথা বলে। সব কিছুর সমন্বয়ে তার যে পরিচয় সেটাকে আমি শ্রদ্ধা করি।				
৮। একজন মানুষের আত্মপরিচয়ে অনেক ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বা বৈশিষ্ট্য থাকাটা ভালো নয়।				
৯। আমাদের শ্রেণিতে, যে বিজ্ঞান সবচেয়ে পছন্দ করে আবার যে বিজ্ঞান সবচেয়ে অপছন্দ করে দুজনই আমার বন্ধু হতে পারে।				
১০। আমাদের ক্লাসের মীনা প্রায়ই অসুস্থ থাকে বলে তাকে আমরা রুগ্ন মীনা বলে ডাকি। সেতো অসুস্থই তাই তাকে ও নামে ডাকাটা যুক্তিযুক্ত।				
১১। মানুষকে কোনো উপাধি/খেতাব/তকমা দেয়ার আগে ভালোভাবে চিন্তা করা উচিৎ।				